বাংলার রূপকথা

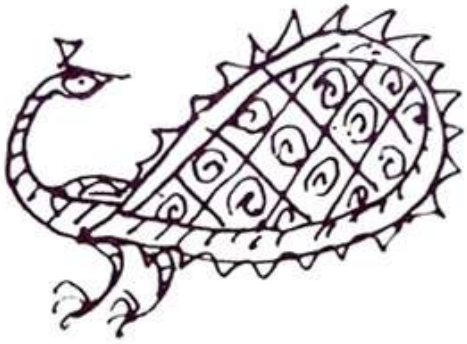

সম্পাদনা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সুধীন্দ্র সরকার

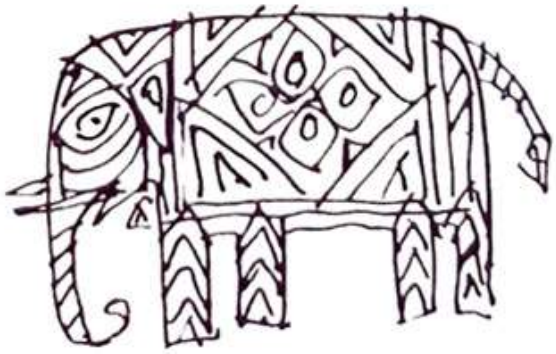

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

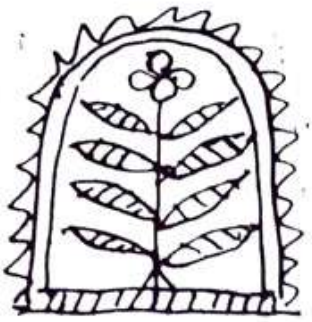

রূপকথার সূচিক্রম

নিখুঁৎ মানুষ	লালবিহারী দে	১
রানি কঙ্কাবতী	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৭
সুয়োরানীর সাধ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪
পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৭
নাসাবতী রাজকন্যা	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২২
ভোঁদড় বাহাদুর	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫
খাঁচাওয়ালা কাঞ্চনলাল	দীনেন্দ্রকুমার রায়	৩৮
সুখু আর দুখু	দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার	৪৩
ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৮
কনকচাঁপা	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৫১
হীরামন	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৫৬
ডানাকাটা পরী	কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	৬৫
নাগরাজ নগাধিপতি	সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৪
লক্ষ্মী	সুখলতা রাও	৮১
যতীনের জুতো	সুকুমার রায়	৮৩
মনোবীণা	নরেন্দ্র দেব	৮৬
বিশুর কেরামতি	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	৯০
হাবাগাবা	সুবিনয় রায়	৯৪
পদ্মের জন্মকথা	হেমেন্দ্রলাল রায়	৯৮
মহারাজের দুর্গতি	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১০৩
সন্দেশের দেশে	মণীন্দ্রলাল বসু	১০৮
ভবানন্দের কাশীযাত্রা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৬
আঙুর-পরি ডালিম-পরি	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৬
মহারাজ মহীপতি	বনফুল	১৩১
ময়ুরপঙ্খী	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৩৫
আলোর ফুল	নিশিকান্ত সেন	১৪৩
পুষ্পরানি	তমাললতা বসু	১৪৮

উদ্ধবের বরাত	সুনির্মল বসু	১৫১
রামধনুকের রাজপুত্তুর	স্বপনবুড়ো	১৫৫
জলপরীদের রাজা নেই	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	১৫৯
দুধ পাহাড় দধিসায়র	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৬৪
রাজপুত্র আর দুইবন্ধু	রাধারানি দেবী	১৭০
অস্তপাহাড়ে মানুষের মেয়ে	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৭৮
মায়া আয়না	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	১৮৪
রাজপুত্তুর সবুর	ত্রিভঙ্গ রায়	১৮৯
রাজপুত্র প্রদীপকুমার	বুদ্ধদেব বসু	২০১
স্বয়ম্বর	লীলা মজুমদার	২০৬
খেয়ালের খেসারত	আশাপূর্ণা দেবী	২১১
সেলাইবুড়ি ও আশ্চর্য ছুঁচ	শৈল চক্রবর্তী	২১৫
কাঠকন্যা	মৌমাছি	২২১
পাখি গান গায়	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	২২৯
সুন্দর ছোট্ট ইঁদুরটি	ধীরেন্দ্রলাল ধর	২৩১
রাজশ্রী	ইন্দিরা দেবী	২৩৬
রতন আর লক্ষ্মী	সত্যজিৎ রায়	২৪০
দোতারা বাজিয়ে কানাই	সুচিত্রা মিত্র	২৫০
বুড়ি মায়ের মোরগ ছেলে	মহাশ্বেতা দেবী	২৫৫
কাক্কাবোক্কার ভুতুড়ে কাণ্ড	শৈলেন ঘোষ	২৫৯
খাই খাই বুড়ো	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	২৬৮
যখের জঙ্গলে	আনন্দ বাগচী	২৭১
সুখীরাম দুখীরাম	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৮
ঝুড়িঅলা	গৌরী ধর্মপাল	২৮২
বরফের দেশের পাখি	মতি নন্দী	২৮৫
ভালুক নাচ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	২৮৮
শক্তি পরীক্ষা	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	২৯১
রাজকুমার বৃষস্কন্ধ আর শ্রীময়ী	নবনীতা দেবসেন	২৯৩
লেখক পরিচিতি		২৯৭

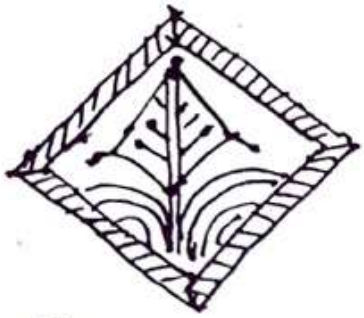

ভূমিকা

ছেলেবেলায় ঠাকুমা'র মুখে গল্প শুনতুম। রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আর সদাগরপুত্রের গল্প। দুষ্টুমি করেছিলেন বলে বাপ-মা'র কাছে বকুনি খেয়েছিলেন। তাতে এতই অভিমান হয়েছে যে, ঘোড়ায় চেপে চার বন্ধু চলেছেন রাজ্য ছেড়ে। তা চলেছেন তো চলেছেনই। দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। চলার তবু কামাই নেই। চলতে চলতে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত সেই নিথরপুরীতে গিয়ে তাঁরা হাজির হলেন, যেখানে স্তব্ধ বিশাল রাজপ্রাসাদের মধ্যে সোনার খাটে মাথা আর রুপোর খাটে পা রেখে ঘুমিয়ে আছেন রূপনগরের রাজকন্যা।

রূপনগরের পথের সন্ধান কে দিত? না ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি। চার বন্ধু যে ঘোড়ায় চড়ে পাড়ি দিতেন সেই পথ, সে তো যেমন-তেমন ঘোড়া নয়, পক্ষিরাজ, তার পিঠে রয়েছে পাখির মতো ডানা, তাই সাত সমুদ্র তেরো নদী সে শূন্যপথে পেরিয়ে গিয়ে হাজির হত রূপনগরে। সেখানে সোনার গাছে হিরের ফুল ফুটে আছে। কিন্তু সেই গাছকে বেড় দিয়ে ফণা উঁচিয়ে রয়েছে মস্ত এক অজগর। তলোয়ারের এক কোপে তাকে কাটতে হবে। তা নইলে ওই ফুল তোলা যাবে না।

গল্প শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়তুম। ঘুমের মধ্যে শুরু হত স্বপ্নের খেলা। পক্ষিরাজের স্বপ্ন, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির স্বপ্ন, সোনার গাছে হিরের ফুলের স্বপ্ন, ঘুমন্ত রাজক-ার স্বপ্ন। আর সেই রাক্ষস-রাক্ষসীদের স্বপ্ন, রাজবাড়ির দিঘির তলায় একটা কৌটোর মধ্যে যাদের প্রাণ-ভোমরা বন্দি হয়ে আছে। এক-ডুবে সেই কৌটো খুঁজে নিয়ে ভোমরাটাকে টিপে মারতে পারলে তবেই রাক্ষস আর রাক্ষসীরা মারা পড়বে, এ ছাড়া নাকি তাদের মরণ নেই।

এ-কালের বাপ-মায়েরা হয়তো বলবেন, এ তো একেবারেই অবাস্তব সব ব্যাপার, ছোটদের এই অবাস্তব গল্প শুনিয়ে লাভ কী। কিন্তু আমরা বলি, এমন কোনও অবাস্তব কথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না, বাস্তবের সঙ্গে যার একেবারেই কোনও যোগ নেই। পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথাই ভাবা যাক। ঘোড়াও বাস্তব, পাখিও বাস্তব। এই দুটো বাস্তবকে মিলিয়েই তো আমরা কল্পনা করছি ওই পক্ষিরাজ ঘোড়াকে। ওটা আসলে বাস্তবের সম্প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ওই সম্প্রসারণের মধ্যেই রয়েছে মানুষের কল্পনার মুক্তি।

কল্পনার এই মুক্তি ছাড়া মানুষ বাঁচে না। সে যন্ত্রে পরিণত হয়। রূপকথা তাই চাই-ই। ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, যাকে আমরা সায়েন্স ফিকশন বলি, সেই কল্পবিজ্ঞানের গল্পও আসলে এক ধরনের রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমা'র সেই রূপকথা তা হলে দোষ কী করল?

আজকালকার ঠাকুমা-দিদিমা'রা অবশ্য, রূপকথার গল্প বলে কথা নেই, কোনও গল্পই বলেন না। অনেক সংসারে অবশ্য ঠাকুমা-দিদিমা নেইও। ছোটরাও তাই গল্প শোনে না। তারা গল্প পড়ে। রূপকথার জগতের গল্পও পড়ে বই কী। যতই বিজ্ঞান পড়ুক, মনটা তো আর যান্ত্রিক হয়ে যায়নি, কল্পনাও তো মুক্তি চায়, তাই রূপকথা ছাড়া তাদের চলে না।

চাহিদা অতএব আছেই। সেইজন্যেই এই সংকলন। যাতে বাংলা রূপকথার সুদীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহ্যের যা-কিছু সেরা নিদর্শন, তাকেই আমরা সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। আশা করছি, রূপকথারও যে বিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটেছে, তারও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত এই সংকলন থেকে পাওয়া যাবে।

মূলত যাদের জন্য এই সংকলন, তাদের যদি ভাল লাগে, তা হলে বুঝব, আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নিখুঁৎ মানুষ

লালবিহারী দে

অনেক অনেক দিন আগে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ছেলেপিলে ছিল না। একদিন একজন সাধু এসে রাজাকে বললেন,

"আপনার যখন এতই ছেলের শখ, তখন আপনাকে একটা ওষুধ দেব, সেটি রানিমা যদি খান, তাঁর যমজ ছেলে হবে। তবে ওষুধটা শুধু এই শর্তে দেব যে একটি ছেলে রেখে, অন্যটি আপনি আমাকে দেবেন।"

যদিও রাজার মনে হল শর্তটি বড়ই কঠিন, তবু একটিও ছেলে না থাকলে কে তাঁর এই বিশাল রাজ্য, এত ধনসম্পদ ভোগ করবে! এই ভেবে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন।

রানিমা সাধুর ওষুধ খেলেন। কয়েক মাস পরে তাঁর অবিকল একরকম দেখতে দুটি ছেলে হল। যমজ ছেলেদের ক্রমে এক বছর, দুবছর, তিন বছর, পাঁচ বছর বয়স হল, তবু সাধু একজনকে নিতে এলেন না। রাজা-রানি ভাবলেন সাধুর বয়স হয়েছিল, নিশ্চয় তিনি স্বর্গে গেছেন। এই মনে করে তাঁরা নিশ্চিন্তে ছিলেন।

সাধু কিন্তু মোটেই মারা যাননি; দিব্যি জলজ্যান্ত অবস্থায় সযত্নে বছর গুনছিলেন। ছেলে দুটির শিক্ষার জন্য পণ্ডিত রাখা হল। দেখতে দেখতে তারা বেশ জ্ঞানী হয়ে উঠল। তা ছাড়া গুরুর কাছে অস্ত্রবিদ্যা, ঘোড়ায় চড়া, তীর-ধনুক ছোঁড়াও শিখল। দুজনেই দেখতে বড় সুন্দর ছিল, সকলেই তাদের যেমন ভালবাসত, তেমনি শ্রদ্ধাও করত।

রাজপুত্রদের যখন ষোলো বছর বয়স হল, সাধু হঠাৎ রাজবাড়ির সিং-দরজায় দেখা দিয়ে, পুরনো শর্ত মতো তাঁর অধিকার চাইলেন। তাই শুনে রাজা-রানির বুক ভেঙে গেল। তাঁদের ধারণা হয়েছিল সাধু ইহজগতে নেই। এখন তাঁকে সশরীরে সিং-দরজায় দাঁড়িয়ে রাজপুত্রদের একজনকে দাবি করতে শুনে তাঁদের মুখ শুকিয়ে গেল।

শোকসাগরে মগ্ন হলেন তাঁরা। কিন্তু কোন উপায় ছিল না, একটি ছেলেকে দিয়ে দিতেই হবে। সাধু যদি রেগে যান, তাহলে শাপ দিয়ে তিনি দুই রাজপুত্রকে, রাজা-রানিকে, রাজবাড়ির, এমনকি গোটা রাজ্যের সবাইকে ভস্ম করে দিতে পারেন!

কিন্তু কোন্ রাজপুত্রকে দেবেন? দুজনেই যে সমান আদরের। রাজা-রানির মনের মধ্যে সে কী নিদারুণ দ্বন্দ্ব!

এদিকে সব কথা শুনে দুই রাজপুত্রই বলতে লাগল,

"আমি যাব!" "আমি যাব!"

ছোটজন বড়কে বলল, "কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও, তুমিই বড়। তুমি বাবার চোখের মণি। তুমি বাড়িতে থাকো, আমি সাধুর সঙ্গে যাই!"

অনেক হাঁ না, কান্নাকাটির পর, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রাজারানি বড় ছেলেকে সাধুর সঙ্গে যেতে দিলেন।

বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে, অন্দরমহলের উঠোনে বড় রাজপুত্র একটি গাছ পুঁতে মা-বাবাকে আর ভাইকে বলল, "এই গাছটি আমার প্রাণ। যতক্ষণ একে সবুজ সতেজ দেখবে, বুঝবে আমি খুব ভালো আছি। যদি কখনও দেখ গাছের খানিকটা জায়গা শুকিয়ে যাচ্ছে, বুঝবে আমার অবস্থা ভালো নয়। গাছটার আগা-গোড়া শুকোলে বুঝবে আমি আর নেই।"

এই বলে মা-বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে, ভাইকে আদর করে, বড় রাজপুত্র সাধুর সঙ্গে চলে গেল।

সাধুর সঙ্গে রাজপুত্র একটা প্রকাণ্ড বনের কাছে এসে দেখল একটা কুকুর দুটি বাচ্চা নিয়ে বনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা বাচ্চা তার মাকে বলল, "মা, আমি ঐ সুন্দর মানুষটির সঙ্গে যেতে চাই। মনে হয় উনি রাজপুত্র।"

কুকুর-মা বলল, "যাও, বাছা।"

রাজপুত্রও খুশি হয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল।

আরও কিছুদূর গিয়ে রাজপুত্র দেখল গাছের ডালে একটা বাজপাখি দুটি ছানা নিয়ে বসে আছে।

একটা ছানা বলল, "মা আমি ঐ সুন্দর মানুষটির সঙ্গে যেতে চাই। দেখে মনে হয় উনি রাজপুত্র।"

মা-পাখি বলল, "যাও, বাছা।"

বাজপাখির ছানা উড়ে এসে রাজপুত্রের হাতের কব্জিতে বসল। রাজপুত্র খুশি হয়ে তাকে সঙ্গে নিল। এইভাবে সাধুর সঙ্গে রাজপুত্র তার কুকুর-বাচ্চা আর বাজ-পাখির ছানা নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে চলল।

হাঁটতে হাঁটতে তারা গভীর বনের ভিতরে, মানুষের বাস থেকে বহু দূরে, একটা পাতার কুটিরের সামনে পৌঁছাল। ঐ কুটিরে সাধু থাকতেন।

তিনি রাজপুত্রকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে এই কুটিরে থাকবে। তোমার প্রধান কাজ হবে আমার

পুজোর ফুল তুলে আনা। বনের সব জায়গায় তুমি ঘুরে বেড়াতে পারবে, কিন্তু কখনও উত্তর দিকে যেও না। সেখানে গেলেই তোমার বিষম বিপদ হবে। বনে অনেক ফল-মূল আছে, ইচ্ছেমতো খেও। ছোট ঝরনা আছে, তার জল পান কোরো।"

ঐ জায়গা আর নিজের কাজকর্ম, রাজপুত্রের মন্দ লাগত না। রোজ ভোরে উঠে বনের ফুল তুলে সে সাধুকে দিয়ে আসত। তারপর সাধু কোথায় যেন চলে যেতেন, সূর্য ডোবার আগে ফিরতেন না। সারা দিনটা রাজপুত্র ইচ্ছেমতো কাটাতে পারত। পোষা কুকুরছানা আর বাজপাখির বাচ্চা নিয়ে সে সমস্ত বনময় ঘুরত। বনে অনেক হরিণ ছিল, তীর-ধনুক নিয়ে তাদের পিছন দৌড়ত। বেশ মনের আনন্দেই সময় কাটত।

একদিন রাজপুত্রের তীর একটা হরিণের গায়ে লাগল। আহত হরিণটা উত্তর দিকে ছুটল। সাধুর বারণ ভুলে গিয়ে, রাজপুত্রও তার পিছন পিছন ছুটল। বনের মধ্যে একটা চমৎকার বাড়ি। হরিণটা দৌড়ে সেই বাড়িতে ঢুকল; তার পিছন পিছন রাজপুত্রও ঢুকে পড়ল। ভিতরে গিয়ে কিন্তু হরিণটাকে আর দেখতে পেল না। তার বদলে দেখল পরমাসুন্দরী মেয়ে পাশার ছকের সামনে বসে আছে।

রাজপুত্রকে দেখে মেয়ে বলল, "এসো অচেনা পথিক; দৈবাৎ এসে পড়েছ বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে এক দান পাশা না খেলে চলে যেও না।"

রাজপুত্র রাজি হল।

বাজির খেলা। স্থির হল রাজপুত্র হারলে সুন্দরীকে তার বাজপাখিটি দিয়ে দেবে, সুন্দরী হারলে সে রাজপুত্রকে ঠিক ঐ রকম আরেকটা বাজপাখি দেবে। সুন্দরী জিতল। কাজেই সে বাজপাখিটাকে নিয়ে, একটা গর্তে রেখে, তক্তা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করল।

রাজপুত্র বলল, "এসো আরেক দান খেলি; এবার আমার কুকুরছানা বাজি রইল। তুমি হারলে ঐ রকম আরেকটা কুকুরছানা দেবে।" সুন্দরী আবার জিতল। আবার সে কুকুরছানাটাকে একটা গর্তে ভরে তক্তা চাপা দিল।

রাজপুত্র নিজেকে বাজি রেখে তৃতীয়বার খেলতে গেল। বলল যদি জেতে ওর মতো আরেকজন রাজপুত্র এনে দিতে হবে। এবারও সুন্দরী জিতল। জিতেই রাজপুত্রকে ধরে গর্তে ভরে, তক্তা চাপা দিল।

ঐ সুন্দরী মেয়ে আসলে মানুষ ছিল না। সে একটা রাক্ষসী, মানুষের মাংস খেত। রাজপুত্রের কচি শরীর দেখে তার জিভে জল এসেছিল। কিন্তু সেদিন তার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছিল বলে, পরের দিনের জন্য গর্তে ভরে রেখেছিল।

এদিকে রাজপুত্রের বাবার প্রাসাদে কান্নাকাটি পড়ে গেছিল। ছোট ভাই রোজ একবার গিয়ে দাদার হাতে লাগানো গাছটিকে দেখে আসত। এতদিন পর্যন্ত রোজই দেখেছিল তাজা সুন্দর সবুজ পাতা, তারপর হঠাৎ সেদিন দেখল গাছের পাতা শুকোচ্ছে। অমনি ছুটে গিয়ে মা-বাবাকে সে খবর দিল। তাঁরা এই মনে করলেন যে বড় রাজপুত্রের কোনও বিষম বিপদ হয়েছে।

ছোট রাজপুত্র স্থির করল, সে যাবে দাদাকে উদ্ধার করতে। যাবার আগে সে-ও ঐ রকম একটি গাছ পুঁতে, মা-বাবাকে বলে গেল, "গাছ যতদিন সবুজ তাজা আছে, আমিও নিরাপদে আছি, পাতা ঝরলে আমার বিপদ, গাছ মরলে আমার মৃত্যু।"

এই বলে রাজার ঘোড়াশাল থেকে সবচাইতে তেজী ঘোড়া নিয়ে সে বনের দিকে ছুটল।

পথে দেখল একটা বাচ্চা নিয়ে সেই মা-কুকুরটি দাঁড়িয়ে আছে। দুই রাজপুত্র অবিকল একরকম দেখতে, কুকুররা ভাবল এ বুঝি সে-ই। বাচ্চা-কুকুর বলল, "ভাইকে নিয়েছ, আমাকেও নাও!"

রাজপুত্র বুঝল দাদাই তবে কুকুরছানা নিয়েছে, সেও অন্যটিকে তুলে নিল।

বনের মধ্যে কিছুদূর যেতেই রাজপুত্র দেখল একটি বাজপাখির ছানা গাছের ডালে বসে আছে। ওকে দেখে পাখিটা বলল, "ভাইকে নিয়েছ, দয়া করে আমাকে নাও।" রাজপুত্র বুঝল দাদাই পাখি নিয়েছে, তাহলে সে এই পথেই গেছে। খুশি হয়ে সে বাজপাখিকে সঙ্গে নিল।

কুকুর আর বাজপাখি নিয়ে সে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে একটি কুটির দেখে বুঝল, এই তবে সাধুর কুটির। ঘরে কেউ ছিল না; না দাদা, না সাধু। কী করবে ভেবে না পেয়ে, ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে নিজে গিয়ে কুটিরে বসে রইল। ঘোড়া ঘাস খেতে লাগল।

সূর্য ডুবলে সাধু ফিরে এসে বললেন,

"তুমি এসেছ বলে খুশিই হয়েছি। তোমার দাদাকে এত করে বারণ করলাম উত্তরদিকে যেও না। তা সে আমার কথা শুনল না, সেই উত্তরদিকেই গেল। সেখানে এক রাক্ষসী থাকে। তোমার দাদা নিশ্চয়ই তার খপ্পরে পড়েছে। কে জানে এতক্ষণে হয়তো সে তাকে খেয়ে ফেলে থাকতে পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রও উত্তরদিকে রওনা দিল। হঠাৎ দেখল সামনে একটা বড় হরিণ। তার গায়ে তীর মারতেই, সে ছুট দিল। সেই হরিণের পিছনে গিয়ে রাজপুত্র দেখল সেটা একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকল। সেই বাড়িতে ঢুকে রাজপুত্র আশ্চর্য হয়ে দেখল হরিণ-টরিনের চিহ্ন নেই, শুধু একজন সুন্দরী মেয়ে পাশা খেলার ছকের সামনে বসে আছে।

রাজপুত্রের বুঝতে বাকি রইল না, এই সেই দুষ্টু রাক্ষসী; দাদা এরই হাতে পড়েছে।

সুন্দরী বলল, "এসেছই যখন, আমার সঙ্গে একদান পাশা খেল।"

ছোট রাজপুত্র অমনি রাজি হয়ে গেল। আগের বারের মতোই বাজি ধরা হল। খেলাও হল এবং রাজপুত্র জিতল। জিতে বলল, "তাহলে দাও ঠিক আমার বাজ-পাখির মতো আরেকটা বাজপাখি।"

কি আর করে সুন্দরী, বড় রাজপুত্রের পাখিটা বের করে দিল। পরস্পরকে পেয়ে দুই পাখির আনন্দ দেখে কে! তারপর আরেক দান খেলা হল। আবার রাজপুত্র জিতল। এবার সুন্দরী রাজপুত্রের কুকুরছানা এনে দিল। সে দুটো তো নেচে কুঁদে একাকার।

তারপর তৃতীয়বার খেলা হল। বলা বাহুল্য রাজপুত্র আবার জিতল। এবার সুন্দরী নানা রকম ওজর দেখাতে লাগল। "তোমার মতো রাজপুত্র এই বনের মধ্যে আমি কোথায় পাব বলো দিকিনি?"

রাজপুত্র ছাড়বার পাত্র নয়। শেষটা বাধ্য হয়ে সুন্দরী বড় রাজপুত্রকে এনে দিল। এতদিন পরে পরস্পরকে দেখে দুই ভাই আহ্লাদে ভরপুর।

তখন রাক্ষসী রাজপুত্রদের বলল, "আমাকে যদি না মার, তাহলে এমন একটা গোপন কথা বলব যার ফলে বড় রাজপুত্রের প্রাণ বাঁচবে।"

ওরা বলল, "বল, কী সে গোপন কথা?"

সুন্দরী বলল, "ঐ সাধু হলেন মা-কালীর উপাসক। তাঁর মন্দির খুব কাছেই। উনি নিখুঁৎ মানুষ হবার সাধনা করেছেন। তার জন্য সদ্য মরা মানুষের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। এর মধ্যে উনি ছটা মানুষকে বলি দিয়েছেন। তাদের মুণ্ডুগুলো মন্দিরের কুলঙ্গিতে সাজানো আছে। সাতটা মানুষ বলি দিলেই ওঁর সাধনার সিদ্ধিলাভ হবে, উনি নিখুঁৎ হবেন। বড় রাজপুত্র হবে সেই সপ্তম বলি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তাহলে ঐ কালী মন্দিরে গিয়ে দেখে আসতে পারো।"

রাক্ষসীর কথা শুনে রাজপুত্ররা মন্দিরে গেল। বড় রাজপুত্র মন্দিরে ঢুকবামাত্র কুলুঙ্গির মুণ্ডুগুলো বিকটভাবে হাসতে লাগল। ঐ রকম দেখে শুনে রাজপুত্রদের গায়ের রক্ত হিম! বড় রাজপুত্র বলল, "আমাকে দেখে তোমরা হাসছ কেন?"

মুণ্ডুগুলো বলল, "হাসছি কারণ দুদিন বাদেই তুমি আমাদের দলে যোগ দেবে। আমরা দলে ভারি হব।"

বড় রাজপুত্র বলল, "তার মানে কী?"

একটা কাটা মুণ্ডু সকলের হয়ে বলল, "রাজপুত্র! কয়েক দিনের মধ্যেই সাধুর সাধনার সিদ্ধি হবে! সেই সময় তোমাকে মন্দিরে এনে বলি দেওয়া হবে। তবে তোমার রক্ষা পাবার একটা উপায় আছে। সেটা হলে আমরাও উদ্ধার পাব।"

রাজপুত্র বলল, "বল সে কী উপায়। আমিও কথা দিচ্ছি তোমাদের জন্য যতটা পারি করব।"

কাটা মুণ্ডু বলল, "তোমাকে বলি দেবার জন্য মন্দিরে এনে, সাধু বলবেন, 'মা কালীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করো।' যেই তুমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে, সাধু এক কোপে তোমার মাথা কেটে ফেলবেন। আমাদের পরামর্শ শোনো। তুমি সাধুর কথা শুনেই বলবে, 'আমি রাজপুত্র হয়ে জন্মেছি, জীবনে কখনও কারও সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিনি; কেমন করে করতে হয়, তাই জানি না। আপনি একবার আমাকে দেখিয়ে দিলে, তবে পারব।'

তারপর যেই না সাধু তোমাকে দেখাবার জন্য মা-কালীর সামনে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বেন, তুমি তখনি তোমার তলোয়ারের এক কোপে তাঁর মুণ্ডুটা কেটে ফেলো। যেই তাঁর মাথা কাটবে, অমনি আমরা সকলেও বেঁচে উঠব, কারণ সাধুর ক্রিয়া শেষ হবে না।"

বড় রাজপুত্র কাটা মুণ্ডুগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ছোট ভাইকে সঙ্গে করে সাধুর কুটিরে গেল।

কয়েকদিন দুজনে ফুল তুলে, বনে বেড়িয়ে কাটাল। তারপর সাধুর সাধনা শেষ হল। তার পরদিন